# ক্রমবিবর্তনে নবোপলীয় প্রযুক্তি ঃ একটি প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মোঃ মশিউর রহমান*

***সারসংক্ষেপঃ***

সমাজ ক্রমবিকশিত সত্ত্বা। এর পরিক্রমণে অভ্যন্তরীণ রদবদল সংঘটিত হয়। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উপনীত হবার ক্ষেত্রে পূর্বেকার অবস্থার মধ্যে পরিবর্তনের বীজ সুপ্ত থাকে এবং পরবর্তী স্তরে তারই বিকাশ ঘটে। নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান-এ সব পাঠক্রমে সমাজের এই বিবর্তন ধারাটি পর্যালোচিত হয়। এর মূল কারণ সমাজকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা এবং বিজ্ঞানমনস্ক উপস্থাপন। ক্রমবিকশিত এই সমাজ সত্ত্বার গ্রন্থনায় মনুষ্যশ্রম হলো শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ যা কিনা তারই মস্তিস্কের প্রসারতা ও চিন্তনের প্রায়োগিক অধ্যায়। কৃৎকৌশলগত উন্নয়ন তথা প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিকাশ সমাজ বদলের একটি মৌল নিয়ামক। সমাজ ব্যাখ্যার প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষ্যযোগ্য।

সমাজের বিবর্তন ব্যাখ্যায় প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয় তাতে নবোপলীয় অধ্যায়কে বিবেচনা করা হয় একটি সামাজিক বিপ্লব তথা প্রচণ্ড অগ্রসরতার অধ্যায় হিসেবে। একটানা সুদীর্ঘকাল পুরোপলীয় স্তর অতিক্রমের পর নবোপলীয় স্তরে সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে সাধিত হয়েছে অদ্ভুত সাফল্য। খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতির পর্যায় পেরিয়ে নবোপলীয় যুগে খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। এর সাথে সূচিত হয়েছে সমাজের ভাবাদর্শিক আঙ্গিক, প্রথা ও মূল্যবোধে পরিবর্তনের ধারা। খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতি বিকাশের পেছনে কাজ করেছে মানুষের কৃৎকৌশলগত চিন্তন ও এর প্রায়োগিকতায় এক ধাপ সাফল্য যা কিনা মানুষ ও প্রাণীকূলের আবাস অঞ্চলের (habitat) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বৃক্ষরোপণ, পশুপালন, কুটির নির্মাণ সর্বোপরি কৃষিকাজের বিকাশের পেছনে দীর্ঘকাল ধরে মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়েছে।

এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতাই সমাজের প্রযুক্তিগত দিক যা কিনা ভাবাদর্শিক দিককেও প্রভাবিত করে; সংশ্লিষ্ট করে আবাসভূমিকে। নবোপলীয় স্তরে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তনও সূচিত হয়েছে, আর সেই সাথে এর সম্প্রসারণ ঘটেছে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশ তা থেকে যে বাদ পড়েনি তার বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক এই অনুসন্ধান এ অঞ্চলের ঐতিহ্যক মাত্রাকে নিঃসন্দেহে বলীয়ান করেছে। তদুপরি এ অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা অদ্যাবধি পর্যাপ্ততর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এমনটি বলবার কোন অবকাশ নেই। প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ যেমন জরুরী একই সাথে পরবর্তী খনন ও গবেষণা কাজেরও বিস্তার ঘটা প্রয়োজন। বর্তমান নিবন্ধটি এর একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। বলা যায় এটি শুধু তাগিদবোধ তৈরির একটি প্রসঙ্গ-উল্লেখ

---

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মাত্র। নবোপলীয় খাদ্য উৎপাদন সংস্কৃতি বিকাশের নেপথ্যে কৃৎকৌশলগত তথা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনাগুলো যে বিবর্তনেরই ধারাক্রম এবং সমাজের মৌল ও উপরিকাঠামো গড়নের অন্যান্য ব্যাখ্যার সাথে প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার যে সাযুজ্যতা রয়েছে– প্রবন্ধটিতে তা আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

## ক্রমবিবর্তনে নবোপলীয় প্রযুক্তিঃ একটি প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

একটি সমাজ-সংস্কৃতিগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সভ্যতার বিকাশ সংঘটিত হয়েছে- এরূপ বক্তব্য এখন নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় যথেষ্ট বিতর্ক-ঊর্ধ্ব বিষয়। সমাজের বিকাশ মূলত একটি প্রক্রিয়া। সমাজ ও সংস্কৃতির এই ক্রমবিবর্তনকে লেনস্কী ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নোক্তভাবে–"Process of change and development in human societies that results from cumulative growth in their stores of cultural information."[১] মানুষের সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ মুখ্যতঃ তারই মস্তিষ্কের প্রসারতা ও শ্রমের বিনিয়োগ ফসল। সে কারণেই লেনস্কী ক্রমবিবর্তনের নির্ধারক শক্তি হিসেবে খুঁজে নিয়েছেন মানুষের সাংস্কৃতিক উপাত্তের (cultural information) প্রসারতার বিষয়টি। আর এ হলো মানুষের মেধা, মনন ও শ্রমের সমন্বয় শক্তি। এই সাংস্কৃতিক উপাত্তসমূহ-ই হলো সমাজের প্রযুক্তি। যা কিনা সমাজ বদলের মৌলিক নির্ণায়ক। প্রযুক্তির প্রসারতাই সমাজের অগ্রসরতা। Ferdinand Tonnies-এর আলোচনায় Gemeinschaft-এবং Gesellschaft-সম্প্রদায়ের যে বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে তাতেও আমরা প্রযুক্তির আবির্ভাব ও বিকাশেরই অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। পৃথিবীর ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক যাবতীয় বিষয়গুলোই মুখ্যতঃ একটি ক্রমবিবর্তনের উপাখ্যান। মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি যেমন ক্রমবিবর্তিত তেমনি তার দৈহিক বিন্যাস, স্থানিক অবস্থিতি, ভূতাত্ত্বিক বলয় সবকিছুর মধ্যেই এক ধরনের ক্রমপরিবর্তণ লক্ষ্যযোগ্য বিষয়। আর এসবের ধাপে ধাপে রয়েছে প্রযুক্তি বিকাশের ধারা, কিন্তু এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো ক্রমবিবর্তনের ধারায় সুদীর্ঘ কালের অতিবাহন। সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে বদল সংঘটনের নিয়ামক তথা প্রক্রিয়ায় প্রলম্বিত সময়কাল। একটি থেকে অন্যটিতে উত্তরণে সময়ক্ষেপণ ঘটেছে দীর্ঘ ধারায়।

মানব সমাজের একটি দীর্ঘ প্রলম্বিত সময়কাল পুরোপলীয় যুগের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে নবোপলীয় যুগের উন্মেষ ঘটে। পুরোপলীয় যুগের পিকিং মানুষ, জাভা মানুষ, নেয়ারন্ডারথাল, হাইডেলবার্গ ও ক্রোম্যাগনন্ মানুষের যুগ পেরিয়ে

হোমোসেপিয়ন্‌স বা আধুনিক মানুষের সময়কালে নবোপলীয় যুগের সূচনা ও বিস্তার ঘটে।

মানুষের সমাজের এই ক্রমবিবর্তনের ধাপসমূহ নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, ভূবিজ্ঞানসহ জ্ঞান রাজ্যের অনেক শাখাতেই আলোকপাতের প্রয়াস রয়েছে। এর ভিত্তিতে আমরা সমাজ সংস্কৃতি ও বিবর্তনের স্বরূপসমূহ উন্মোচনের সুযোগ পাই বটে, তবে একই সঙ্গে এই ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আলেখ্য বর্ণনাকালে অসংখ্য উত্থিত প্রশ্নের অনুসন্ধানও কম মেলে না। কারণ ইতিহাস-পূর্ব বহু বিষয় আছে যার প্রমাণ সত্যতা জাহির করা দুঃসাধ্য ও কষ্টকর। তা সত্ত্বেও সমাজের বিবর্তন ধারা ব্যাখ্যায় যে মৌলিক প্রত্যয় ও তত্ত্ব বলয় নির্মিত হয়েছে তার নিরীখে পর্যালোচনা করতে গেলে আমরা নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব কোনটির মনোভঙ্গীকেই উপেক্ষা করবার কোন অবকাশ খুঁজে পাই না। কারণ অনেকাংশে একটির পর্যালোচনা অন্যটির সম্পূরক ও সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

নৃতত্ত্বের সাথে প্রত্নতত্ত্বের যোগসূত্রতা এড়িয়ে যাবার বিষয় নয়, বরং তা সুদৃঢ়ভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতারই বিষয়। তা সত্ত্বেও প্রত্নতত্ত্বেরও একটি স্বাতন্ত্রিক উন্মেষ ও বিকাশের ইতিহাস রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব মৌলিক কিছু বিষয়ে নৃতত্ত্বের আলোচনা থেকে নিজের আলোচনাকে পৃথক করতে সক্ষম হয়েছে। সে কারণেই সমাজ ও সমাজ ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস যখন পর্যালোচিত হয় তখন স্পষ্টতইঃ নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকরণ ও ধরণ, ধাপ বিন্যাসের স্বকীয়তা দেখা যায়। নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও ধাপবিন্যাসের স্বাতন্ত্রিকতা থাকলেও এর সাযুজ্যতাও খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ সময়কাল এবং সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিকত্বের অস্তিত্ব ক্রিয়াশীল থাকে।

ইতালীয় রেনেঁসাস সময়কাল থেকেই মুখ্যতঃ প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ লক্ষ্য করা গেছে। বস্তুতঃ ইতালীয় রেনেঁসাসের এই সময়কালটিতে মানুষের মধ্যে অতীত অনুসন্ধানের এক তাগিদ গভীরভাবে অনুভূত হয় এবং সত্যানুসন্ধানের প্রয়াস জোরদার হয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোম সম্পর্কে জানবার জন্য কৌতূহলবোধও তখন বাড়ে। ইতালীয়দের এরূপ আগ্রহ খুব দ্রুত ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে মানুষের মধ্য বিপুল উদ্দীপনা, প্রাচীন ভাস্কর্য, মূর্তি সংগ্রহের প্রতি ধনবানদের আগ্রহ এসব লক্ষ্য করা যায়। সমাজের ধনপতিরা প্রাচীন মূর্তি ও ভাস্কর্যের ব্যক্তিগত সংগ্রহের প্রবৃত্তি এমনভাবেই বাড়িয়ে দিয়েছিলো যে, তার কোন কোনটি রীতিমতো এক একটি প্রাচীন জিনিসপত্র সমৃদ্ধ যাদুঘরে রূপ নিয়েছিলো। উদাহরণস্বরূপ ১৬৮৩ সালে গড়ে ওঠা অক্সফোর্ডের এসমোলিয়ান মিউজিয়ামের (ashmolean museum) কথা বলা যায় যেখানে শুধুমাত্র ধ্রুপদী চিত্রকলা সংরক্ষণের ব্যবস্থাই করা হয়নি, বরং এর মধ্যে এক ধরনের জাতিগত অভীক্ষা (ethnological

curiosity) লক্ষ্য করা গেছে। উত্তর অ্যামেরিকান ইন্ডিয়ান চীপ পত্তহ্যাটনের ম্যানটেল, পোলিনেশিয়া থেকে ডোঙ্গা বা শালতির দাঁড় (canoe paddles); এবং কঙ্গো থেকে গজদন্তের চামচ (ivory spoons)- এসব সামগ্রী সংগ্রহ করে উক্ত যাদুঘরে আনা হয়েছিল।[২] ইউরোপীয়ানরা এভাবে করেই অতীত সম্পর্কে আরো বেশি তথ্য সংগ্রহ এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ হবার চেষ্টা চালিয়েছে। বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবন-ধারণের বিচিত্র পথ ও জীবন যাত্রা তথা সংস্কৃতিকে জানবার ও বুঝবার চেষ্টা তাদেরকে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও মনোভঙ্গী বিকাশে ক্রিয়াশীল রেখেছে।

যাদুঘরগুলোতে কাজ করবার ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানী এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের যৌথভাবে কাজ করা প্রয়োজন পড়ে। যাদুঘরের কিউরেটর সংগৃহীত জিনিসপত্র সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কতিপয় নিয়মনীতি অনুসরণ করে থাকে। পরিকল্পিত উপায়ে তার শ্রেণীবিন্যাস ও সংরক্ষণ করতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে একটি ডেনিশ জাতীয় যাদুঘরে christian thomsen নামের একজন যাদুঘর কিউরেটর প্রাচীন জিনিস পত্রাদি সংরক্ষণ ও সুব্যবস্থিত ও বিন্যস্ত করতে তিনটি সময় ও সংস্কৃতির প্রকরণের আশ্রয় নেন। যা ছিল-পাথর, ব্রোঞ্জ ও লোহা-এরূপ তিনটি সামগ্রী ব্যবহার ও সংস্কৃতির বিকাশ ও বিবর্তনের ভিত্তিতে। এটি ছিল একটি পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস। দীর্ঘতর সময়কাল জুড়ে পৃথিবীর ইতিহাসে পাথরের যুগ ছিল; যা পরবর্তীকালে ব্রোঞ্জ ব্যবহারের সময়কালে উত্তীর্ণ হয় এবং ক্রমশ তা লোহার যুগে রূপ নেয়। এই সরল পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসটি চমৎকার একটি কাঠামোর প্রতিফলন যার মধ্য দিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্রমধারাকে স্পষ্টতঃ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

১৮৫৭ সালে ইতিহাসপূর্ব (prehistory) প্রত্যয়টির পরিচয় ঘটে। Jhon Lubbock (১৮৩৪-১৯১৩) এর ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত "Prehistoric Times" নামক গ্রন্থের প্রকাশনার মধ্য দিয়ে প্রত্যয়টি বহুল ব্যবহার ও জনপ্রিয়তার যাত্রা শুরু হয়। এই গ্রন্থটিতে লেখক পাথরের যুগকে দু'টি ভিন্ন প্রকরণে ভাগ করে দেখবার প্রয়াস পান। এটিকে নিম্নোক্ত রূপে দেখা হয়েছে।[৩]

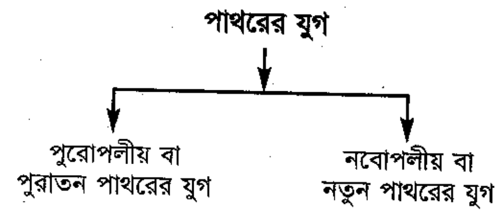


Lubbock এর আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে যে, পুরাতন পাথরের যুগে ইউরোপের নানা জায়গায় ম্যামথ, পর্বত বা গুহার ভল্লুক, পশমী গণ্ডার জাতীয় নানা

প্রকার প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল যা পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পুরোপলীয় ও নবোপলীয় যুগে পাথর ব্যবহারের ক্ষেত্র ও নির্মাণ শৈলীতে পার্থক্য রয়েছে।

আঠারোশ' পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের দিকে সুরক্ষিত সুইজ হ্রদ তীরবর্তী বসতি অঞ্চলে খনন কাজ পরিচালনা ও আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় প্রাগৈতিহাসিক কাল সম্পর্কিত গবেষণা ভীষণভাবে গতিবান হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রাচীন প্রকরণাদির কিছু কিছু ছিল নবোপলীয় আমলের, আবার তাম্র ও লৌহ যুগের তৈজষপত্রাদিও উদ্ভাবিত হয়েছে। পুরোপলীয় কালের কিছু অঞ্চল জুড়েও তখন খনন কাজ চালানো হয়। বিশেষ করে ফ্রান্সের Dordogne অঞ্চলে। ১৮৭৯ সালে স্পেনের Altamira-তে পুরোপলীয় যুগের সুদৃশ্য গুহাচিত্রের অনুসন্ধান মেলে। পরবর্তী দশকগুলোতে হাড়, মাটি ও পাথরের তৈরি বহু পুরোপলীয় যুগের শিল্পশৈলী, গুহাচিত্র প্রভৃতির খোঁজ পাওয়া গেছে। Lubbock এর শ্রেণীকরণ ও সময়বন্টনকে আরো কিছুটা পরিশোধিত উপায়ে Thomsen ব্যাখ্যা করেছেন তিনটি পর্যায়ে। প্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ এবং লৌহ যুগ। একটু মনোযোগী হলেই লক্ষ্য করা যায় যে, যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও কৃৎকৌশলগত উন্নয়ন সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে, প্রকৃতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্রমোচ্চ হারে প্রগতির ধারায় বাড়ছিল। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে মানুষের সমাজে বিশেষীকরণ (Specialization), শ্রম বিভাজন (Division of labour) এবং সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরস্থ জটিল সমন্বয় ও ধারা সমূহেরও বিকাশ ঘটেছে।

পাথরের যুগকে নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চ পুরোপলীয় (পুরাতন পাথরের যুগ), মেসোলেথিক (মধ্য পাথরের যুগ) এবং নবোপলীয় (নতুন পাথরের যুগ) এই শ্রেণীকরণেও অনেক ক্ষেত্রে বিন্যস্ত করা হয়। আমরা জানি যে, অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় নিকট প্রাচ্যে (Near East) সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল তুলনামূলকভাবে দ্রুত ও বেশি। সুতরাং যখন নিকট প্রাচ্য অঞ্চলে নবোপলীয় যুগের শুভ সূচনা ও বিকাশ এমনকি ব্রোঞ্জ যুগের অর্থনীতির প্রায়োগিকতা লক্ষণীয় তখন উত্তর ইউরোপ অঞ্চলে মেসোলেথিক বা মধ্যপাথরের যুগ-সংস্কৃতির প্রবাহ চলছিল।

মুখ্যতঃ পুরোপলীয় সময় ও সংস্কৃতি থেকে নবোপলীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে উত্তরণ ছিল একটি সামাজিক, কৃৎকৌশলগত ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব। পুরোপলীয় এবং নবোপলীয় প্রত্যয় দুটোকে বিবেচনা করা উচিত একটি সাংস্কৃতিক আলেখ্য দিয়ে। কেননা এ দুটি প্রত্যয় দিয়ে যেমন একটি সময়কালকে ইঙ্গিত করা হয়, ঠিক তেমনি একই সঙ্গে সেই সময়ের সমাজ সংস্কৃতি ও জীবনাচারকে এর মধ্য দিয়ে বোঝানোর সুস্পষ্ট প্রয়াস রয়েছে।

প্লায়োসিন (Pliocene) এবং প্লেইসটোসিন (Pleistocene) নামক দুটো ভূতাত্ত্বিক প্রত্যয়ের সঙ্গে পুরোপলীয় এবং নবোপলীয় প্রত্যয়যুগলকে সমরূপ

ভাববার কোন অবকাশ নেই। মানব বিবর্তনের ব্যাখ্যায় এর একটি হলো সাংস্কৃতিক আঙ্গিক অন্যটি ভূতাত্ত্বিক।

সময় সমাজ ও সংস্কৃতির এই আলেখ্যকে ইতিহাস ও ইতিহাসপূর্ব যে গন্ডীতে এনেই ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা হোক না কেন সুনির্দিষ্ট গাণিতিক সংখ্যার ভিত্তিতে তাকে হয়তো সন্নিবেশিত করা যাবে না। তবে এ কথা সত্য যে, সমাজ ক্রমবিবর্তনের ধারায় এগিয়েছে। এর অভ্যন্তরে বদল সংঘটিত হয়েছে। ভূ-গঠন যেমন বদলে নতুন রূপ ধারণ করেছে। একই সঙ্গে প্রাণী ও মনুষ্যজাত বদলে গেছে; বদলের পরিক্রমায় এসেছে সমাজ ও তার সংস্কৃতিও। এর মৌল কাঠামো ও উপরিকাঠামোয় সূচিত হয়েছে ক্রমধারায় পরিবর্তন। নিম্নোক্ত ছকটিতে তা প্রতিভাত হয়ে।[৪]

## সারণী– ১

### পর্যায়ক্রমিক তালিকা

| মানুষের ধরণ | সাংস্কৃতিক আলেখ্য | ভূতাত্ত্বিক গড়ন | আনুমানিক সময়কাল |
|---|---|---|---|
| পিথেক্যানথ্রোপাস (জাভা মানুষ) | প্রাথমিক পুরোপলীয় যুগ (খাদ্য সংগ্রহ) | প্লেইসটোসিন যুগ | ৫০০,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ |
| সিনানথ্রোপাস (পিকিং মানুষ) | প্রাথমিক পুরোপলীয় যুগ (খাদ্য সংগ্রহ) | প্লেইসটোসিন যুগ | ৫০০,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ |
| নেয়ান্ডারথাল | প্রাথমিক পুরোপলীয় যুগ (খাদ্য সংগ্রহ) | প্লেইসটোসিন যুগ | ১৫০,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ |
| নেয়ান্ডারথলয়েড | প্রাথমিক পুরোপলীয় যুগ (খাদ্য সংগ্রহ) | প্লেইসটোসিন যুগ | ১৫০,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ |
| হোমো-সেপিয়েন্স | পরবর্তী পুরোপলীয় যুগ | প্লেইসটোসিন যুগ | ৫০,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ |
| (ক্রো-ম্যাগনান) | মেসোলেথিক | হলোসিন যুগ | ৮,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ |
| | নবোপলীয় বিপ্লব (খাদ্য উৎপাদন) | হলোসিন যুগ | ৫৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ |
| | ধাতু যুগ | | ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ |
| | ব্রোঞ্জ যুগ | | ৩৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ |
| | লৌহ যুগ | | ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ |

মানবেতিহাস ব্যাখ্যায় তথা ক্রমবিবর্তনের ধাপ উন্মোচনের প্রয়াসে যে সাংস্কৃতিক আলেখ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে এটিই মূলতঃ প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির এই বিশ্লেষণ একরূপ আলোকবর্তিকা। যার মধ্য দিয়ে মানুষের সাংস্কৃতিক উপাত্ত সংগ্রহ এবং এর ভিত্তিতে সমাজ বদলের কাজ করার যে প্রবাহ চিত্র তা ফুটে উঠেছে। সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস চর্চা এবং অতীত মানুষের জীবনালেখ্য অনুসন্ধান প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, আধুনিক কালের প্রত্নতাত্ত্বিকরা সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার (Cultural Process) পুরো বিষয়টি সম্পর্কে জানতে অধিকতর কৌতুহলী ও উদ্দীপ্ত। সে কারণেই প্রত্নতত্ত্ব আজ আর কোথায় এবং কখন একটি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল ততটুকু জানবার মধ্যেই সীমিত থাকে না, বরং কেন তা ঘটেছিল সে সব বিষয়েও অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে। এরূপ মনোভঙ্গীর কারণেই প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাদের গবেষণা অঞ্চলের পরিবেশ অভিযোজন (Ecological adaptation)- জনবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন, (demograpy) বসতি ধারা (Settlement pattern) এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাদির বিশ্লেষণ (the analysis of cultural system) সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহী।[৫]

প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় এরূপ মাত্রা সন্নিবেশিত হয়েছে বলেই মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো ক্রমাগত সুস্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এর ফলে রাজনৈতিক ইতিহাস যা কিনা শুধুমাত্র রাজন্যবর্গের কল্প-কাহিনী ও বীরগাথার মধ্যে সীমিত থেকে বিজ্ঞানবিমুখ জ্ঞান চর্চায় রূপ নিচ্ছিল, সে পর্যায় থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের সঠিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ জানবার বিষয়গুলো স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। প্রাচীন মানুষ সম্পর্কে জানবার ক্ষেত্রগুলিতে নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এসবের মধ্য দিয়ে যা স্পষ্ট হয়, তা হলো মানুষের সমাজে বিবর্তন ধারা এবং সেই সাথে বিবর্তন ধারায় মানুষের নিজস্ব শ্রম-ই যে শ্রেষ্ঠ সম্বল এবং মানুষ যে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক তা ফুটে ওঠে। পুরোপলীয় যুগ থেকে অন্য স্তরে উপনীত হবার যে বিবর্তন সেখানে মনুষ্য শ্রম ও সংঘের বিবর্তন লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু হয়, জিজ্ঞাসু হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক নানামুখী বিশ্লেষণে এমন একটি উত্থিত প্রশ্ন হলো– প্রাথমিক নবোপলীয় যুগে কিছু সংখ্যক মানুষ কি দ্রুততার সাথে শস্যচারা বপনের (Plant domestication) উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল? যার ফলে অনিবার্যভাবেই সমাজের ঐরূপ রূপান্তর ঘটলো। নৃতাত্ত্বিক Lewis R. Binford-এর অভিমত, শিকার ও সংগ্রহ সমাজে একটি পরিণত পর্যায়ে সমাজের প্রান্তিক ও অপেক্ষাকৃত কর্মসংশ্লিষ্টতাবিমুখ মানুষগুলোর ওপর এক ধরনের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক চাপ অনুভূত হয়েছে। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে ঐ সমাজের প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে খাদ্য উৎপাদনের নতুন কোন কৌশল ও উপায় অনুসন্ধানের তাগিদবোধ বেড়েছে। এরকম তাগিদ ও প্রয়োজনই সমাজকে ধীরে ধীরে পরিবর্তনে

বাধ্য করে। সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে রদবদলাগুলো সংঘটিত হয় মনুষ্যসংঘ, সম্প্রীতি, সংঘাত- এসবের যৌগিক মিশ্রণ ও মিথস্ক্রিয়ার ধারাক্রমে। আর এর পেছনে যে বিষয়টি কাজ করে তা হলো মানুষের সমাজের শ্রেণীভেদ তথা শ্রেণীকরণ প্রক্রিয়াটির সচলতা। আদিম পর্যায়ের শ্রেণীহীনতার বলয় ভেঙ্গে সমাজের পরবর্তী বিকাশেই শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং এই শ্রেণী সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ সমাজের রূপান্তরগুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সমাজের শ্রেণীকরণের ব্যবস্থা (the system of classifying society) সম্পর্কিত অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বেশ ক'জন নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষ অবদান রেখেছেন। আমেরিকান নৃতত্ত্বেরও একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লুইস হেনরী মর্গান সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের তিনটি বিশেষ পর্যায়ের কথা বলেছেন। বন্যদশা, বর্বরদশা এবং সভ্যতা। প্রথম দুটি পর্যায়কে আবার উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন এরূপ তিনটি ধাপে বিভক্ত করেছেন। সমাজ একটি পর্যায়ে থেকে অন্য পর্যায়ে উপনীত হবার পেছনে মুখ্যতঃ যে বিষয়টি নির্ধারক হিসেবে কাজ করে তা হলো প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন। মর্গানের পরেও যারা সমাজ বিবর্তনের এই ধরণসমূহ উদ্ভাবনের প্রয়াস চালিয়েছেন তাদের প্রায় সকলেই প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অগ্রসরতা সমাজ বিকাশের নির্ধারক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ব্রিটিশ সমাজ বিজ্ঞান L.T. Hobhouse, ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক, ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক V. Gordon Childe, আমেরিকান নৃতাত্ত্বিক Walter Goldschmidt - এবং সমাজবিজ্ঞানী Duncan প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনায় এ বিষয়গুলো উল্লেখিত হয়েছে। Goldschmidt- সমাজ বিকাশের ধাপসমূহকে ৬টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন।[৬]

## সারণী- ২

### গোল্ডস্মীরে সমাজ প্রকরণ ছক

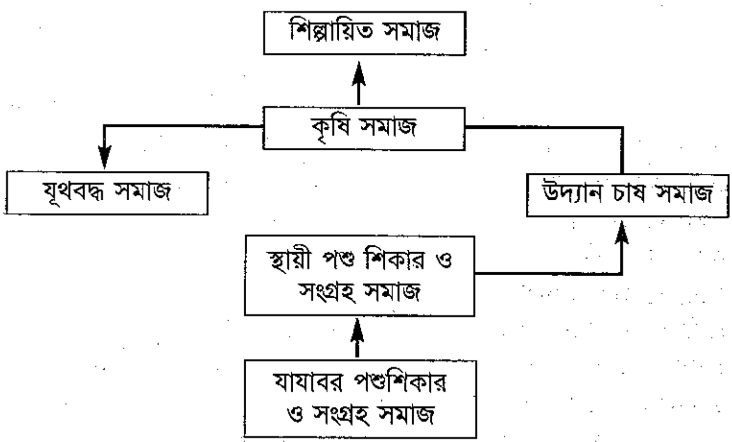

Goldschmidt-এর বর্ণনায় স্পষ্টতঃই প্রতিভাত হয়েছে যে, সমাজ যতবেশি উচুস্তরে উপনীত হয়েছে তাতে ততবেশি প্রযুক্তিগত প্রসারতা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যায় তিনি এ বিষয়টিও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রযুক্তিগত এই প্রসারতা পূর্বেকার সমাজ (Herding society) প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে কৃষি সমাজের তুলনায় কম অগ্রগামী ছিল বটে, কিন্তু ঐ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই পরবর্তী সমাজ বিকাশের যাবতীয় উপকরণাদি তৈরি হয়েছে। ছকে পশু শিকার ও সংগ্রহ সমাজের স্থায়ী ও যাযাবর- যে দুটি প্রকরণের কথা বলা হয়েছে এর সাথে মর্গানের বর্ণিত 'বন্যদশা' এবং যূথবদ্ধ ও উদ্যান চাষ সমাজের সঙ্গে 'বর্বর সমাজ' এবং কৃষি ও শিল্প সমাজের সঙ্গে 'সভ্যতা' পর্যায়ের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সারণী আকারে বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে দেখা যায়।

## সারণী– ৩
### সমাজ বিবর্তনের তুলনামূলক চিত্র

| গোল্ডস্মিথ | মর্গান |
|---|---|
| যাযাবর পশু শিকার ও সংগ্রহ সমাজ এবং স্থায়ী পশু শিকার ও সংগ্রহ সমাজ | বন্যদশা সমাজ |
| যূথবদ্ধ সমাজ ও উদ্যান চাষ সমাজ | বর্বর সমাজ |
| কৃষি সমাজ ও শিল্প সমাজ | সভ্যতা |

লেনস্কী গোল্ডস্মীথের বর্ণিত প্রকরণের আলোকে আরো বিস্তৃত এবং নিজস্ব একটি মনোভঙ্গী প্রকাশের প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি সমাজের শ্রেণী করণের ব্যবস্থা উদঘাটন করতে গিয়ে নিম্নোক্ত ধাপ সমূহের বর্ণনা করেছেন।[৭]

## সারণী-৪
### লেনস্কীর সমাজ বিকাশের ধারাক্রম

| | | | |
|---|---|---|---|
| | শিল্প সমাজ Industrial Societies | | |
| | ↑ কৃষি সমাজ Agrarian Societies → | সমুদ্রতীরবর্তী সমাজ Maritime societies | |
| | ↑ অগ্রগামী উদ্যান চাষ সমাজ Advanced Horticultural Societies | | শংকর সমাজ (Hybrid Societies) |
| যূথবদ্ধ সমাজ ← (Herding Societies) | ↑ সরল উদ্যান চাষ সমাজ Simple Horticultural Societies → | মৎস শিকারী সমাজ Fishing Societies | |
| | ↑ পশু শিকার ও সংগ্রহ সমাজ Hunting And Gathering Societies | | |

সমাজ বিকাশের নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক যে কোন বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতেই বিবেচনা করা হোক না কেন-সমাজের একটি স্তর থেকে অন্যস্তরে উপনীত হবার যে ধারাক্রম তাতে প্রযুক্তিগত বিকাশের বিষয়টি-ই মুখ্য এবং প্রধান নির্ধারকও বটে।

আর প্রযুক্তিগত এই বিকাশের পেছনে রয়েছে মানুষের শ্রমের ইতিহাস। মানুষের মেধা মনন ও শ্রমের সম্মিলন-ই মূলতঃ প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিকাশের মৌলিক নিয়ামক। পুরোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় যুগে উত্তরণের পেছনে এই

মৌলিক নিয়ামকটিই কাজ করেছে প্রতিভূ হিসেবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, প্রযুক্তি প্রত্যয়টিকে সংকীর্ণ অর্থে সংজ্ঞায়িত করবার কোন অবকাশ নেই। প্রযুক্তির সাথে মানুষের সৃজনশীলতা তথা মস্তিষ্কের প্রসারতার স্বীকৃতি গভীরভাবে সংযুক্ত। John J Honigman এর মতে[৮] As a cultural term 'technology' refers to all of the multi-Industrial customs for manipulating material entities and substances. It includes techniques of mainpulating raw materials to produce artifacts, ways of handling or modifying artifacts, and means of manipulating animal and human bodies, including one's own body.

Robert B Taylor এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যার অবতারণায় বলেন[৯]- Technology, therefore, extends into all aspects of life. The way water is applied in baptism, kissing the hand in greeting a respected elder, a way of mixing art pigments, and the means of holding a saxophone are all techniques.

তবে একথা সত্য যে, কৃৎকৌলশগত উন্নয়ন তথা প্রযুক্তির প্রসারতা আকস্মিক কোন বিষয় নয়, সমাজ অভ্যন্তরে কাঠামোদি এবং এর ভূ-গঠন ও অবস্থিতি- প্রযুক্তির সাথে সমন্বয়ক ধারায় এগোয়। আদিকাল থেকেই মানুষ কৃৎকৌশলগত যেসব উদ্ভাবনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে এবং একটি কার্যকর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এর পেছনে কাজ করেছে মানুষ ও প্রাণীকূলের প্রাকৃতিক আবাস অঞ্চলকে (natural habitat) নিয়ন্ত্রণে আনা এবং উন্নত করণের উদ্যমী প্রচেষ্টা। শুধু তাই নয়, ঘরবাড়ি, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, যন্ত্রপাতি- এজাতীয় অত্যাবশ্যকীয় উপকরণাদি তৈরি ও ব্যবহারের জন্য ও মানুষকে তার প্রযুক্তিগত ভাবনা এবং এর প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিকের প্রতি মনোযোগী হতে হয়েছে। এক্ষেত্রে আরো লক্ষনীয় বিষয় হলো মানুষের কৃৎকৌশলগত তথা প্রযুক্তিগত দিকের সাথে সমাজের ধর্মীয় এবং অন্যান্য অ-কৃৎকৌশলগত (nontechnological) প্রথা ও বিশ্বাসসমূহ এবং ইকো-সিস্টেমের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতা ও যোগসূত্রতা রয়েছে। একটি ইকো-সিস্টেমের মধ্যে প্রযুক্তি ও প্রযুক্তির বাইরের বিষয়গুলো পরস্পর নির্ভরশীল এবং একটি অপরটির সঙ্গে যোগসূত্রতার বন্ধনে সম্পর্কিত। সমাজের সকল স্তরেই এই বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে। পুরোপলীয় যুগে প্রযুক্তিগত বিকাশ ততটুকুই সম্ভব হয়েছে, যতটা ঐ সমাজের সামাজিক গতিধারার সঙ্গে সমন্বিত থেকেছে। আবার নবোপলীয় যুগের প্রযুক্তিগত বিকাশ ও অন্যান্য সামাজিক উপকরণাদির মধ্যে রদবদলকে ত্বরান্বিত করেছে।

একদিকে প্রযুক্তির সাথে আবাসভূমির (habitat) সম্পর্ক এবং অন্যদিকে প্রযুক্তির সাথে সামাজিক এবং ভাবাদর্শিক প্রথাসমূহের (Social and ideological customs) সম্পর্ক দুটো ধারাই সমাজে প্রযুক্তির প্রভাব ও প্রাধান্যকে তুলে ধরে। নৃবিজ্ঞানের কালচারাল ইকোলজীর আলোচনা পর্যায়ে এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে

বিবেচিত হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা সংগঠনের ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও ভাবাদর্শিক প্রথাসমূহের ওপর প্রযুক্তির প্রাধান্যবিস্ত ারকারী প্রভাব রয়েছে কিনা-এ নিয়ে বেশ কিছু নৃতাত্ত্বিক বিতর্কের অবতারণা ঘটেছে। Marin Harris এক্ষেত্রে যথাযথ মনোভঙ্গী হিসেবে সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ (Cultural materialism) কে চিহ্নিত করেছেন।[১০] মানুষের জীবনে সামাজিক এবং ভাবাদর্শিক দিকগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারের নির্ধারক হিসেবে তিনি সাংস্কৃতিক বস্তুবাদের কথা বলেছেন। সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ মূলতঃ কতগুলো বস্তুগত উপকরণকেই (material factors) অন্তর্ভুক্ত করে। এই বস্তুগত উপকরণগুলো হলো- পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক।

পুরোপলীয় যুগের পশু শিকার ও সংগ্রহবৃত্তির সংস্কৃতিতে খুব বিস্তৃতভাবে প্রযুক্তির প্রসারতা সংঘটন সম্ভবপর ছিল না যা কিনা তাদের নিজস্ব আবাস অঞ্চলকে (habitat) আরো পূর্ণাঙ্গভাবে এবং দক্ষতার সাথে ব্যবহারকে নিশ্চিত করে। কেননা শিকার ও সংগ্রহ সংস্কৃতির পরিমন্ডলে যে সামান্য পরিমাণ প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছিল তার মধ্য দিয়ে বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যাবৃদ্ধির ঘটনা সংঘটিত হয়নি। অর্থাৎ জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যে অনুকূল উপকরণাদি প্রয়োজন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন সে পর্যায়ে পৌছেনি। একই কারণে জনসংখ্যার বহুল পরিমাণের সঙ্গে সৃষ্ট ও সামঞ্জস্যপুর্ণ বিস্তৃতি আইন, শাসন ও অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থাদিও গড়ে উঠেনি। পুরোপলীয় মানুষের মধ্যে একজনের সঙ্গে অন্যজনের সম্পর্ক কিরূপ হবে তা নির্ধারিত হতো অনেকাংশেই পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধনের ভিত্তিতে। ধর্মীয় রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যে কোন ধরনের কর্মপ্রক্রিয়ার প্রসঙ্গই আসুক না কেন তা মূলত পরিবার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। কখনো কখনো বড়জোর সে দায়িত্বটি নির্ধারিত হতো ব্যান্ড (band) এর মাধ্যমে, ব্যান্ড হলো কয়েকটি পরিবারের একত্রিত অবস্থান যারা একই সঙ্গে এক জায়গা থেকে অন্যত্র গমন করতো।

বর্ণিত আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে বলা যায় যে, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রযুক্তিগত যে দিক, তা মানুষ প্রাণীকূলের আবাস অঞ্চলের সংগে সংশ্লিষ্ট যে প্রযুক্তিগত দিক, তার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সাংস্কৃতিক বস্তুবাদেও এরূপ ধারণা-ই পোষণ করা হয়। প্রসঙ্গতঃ Taylor এর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তাঁর অভিমত,- According to cultural materialism, habitat and technological factors initially give rise to social and ideological factors rather than vice versa.

তা সত্ত্বেও খুব নির্দিষ্টতার সঙ্গে নিরূপণ করা কঠিন বিষয় যে, পুরোপলীয় যুগের খাদ্য সংগ্রহ সমাজের সংস্কৃতি ঠিক কোন ধাপসমূহ চারা রোপন (Plant-cultivation) বা খাদ্য উৎপাদনের দিকে সমাজকে ধাবিত করলো। প্রযুক্তিগত ধারাসমূহের সঙ্গে ভাবদর্শিক এবং সামাজিক প্রথার আন্তর্নির্ভরতা ও সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি বিবেচনার স্বার্থে আমরা ধরে নিতে পারি যে, পুরোপলীয় যুগের শেষভাগে

কিছু গোষ্ঠিবদ্ধ দলসমূহের সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া এবং জীবনযাত্রা প্রণালী এমনতর পর্যায় পৌছেছিল যে তারা অধিকতর খাদ্য পাবার আশায় শস্যের চারা রোপন শুরু করেছিল অথবা শিকারের পশুগুলোকে আরো কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ এবং পোষ মানানোর ব্যবস্থা করেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অভিমতসমূহ অনেকটা এরকমই বটে। Robert Braidwood -এর মতে A nonagricultural society which had developed an extensive complex of woodworking and other techniques in response to increasing forests and other habitat changes might develop a more experimental orientation to life.[১১]

মানুষ ও প্রাণীকূলের আবাসভূমিতে যে পরিবর্তন নবোপলীয় যুগে সংঘটিত হয়েছে তাতে কৃৎকৌশলগত যে উন্নয়নের প্রবাহ দেখা দিয়েছে তার ভিত্তিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মানুষের জীবন যাত্রায় প্রযুক্তির ধারা বিকাশে একটি পরীক্ষা নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা (experimental orientation) সংঘটিত হয়েছে। নবোপলীয় সমাজে উত্তরণের ক্ষেত্রে বৃক্ষচারা (Plant) এবং পশুপাল (animal) নিয়ে বড় ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষ অগ্রসর ও সফলকাম হয়েছে। শুধু তাই নয়, কাজের নানারকম কৌশল এবং শিকার ও শিকারকে ফাঁদে ফেলার যে সব কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে তা সনাতনী ব্যবস্থা ও ভাবধারার বিপরীতে নতুন অগ্রসরতা ও ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যযোগ্য বিষয় হলো যে, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এককভাবে সংঘটিত হয় না। প্রযুক্তির উন্নয়ন একটি ইকো-সিস্টেমের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হয় এবং এগুতে থাকে।

প্রযুক্তির সাথে আবাস অঞ্চলের এবং এ দুটির সঙ্গে ভাবাদর্শিক তথা অপ্রযুক্তিগত দিকগুলোর যে পারস্পরিক যোগসূত্রতা তা নবোপলীয় সংস্কৃতি পর্যালোচনাতেও অনুধাবন করা যায়। সমাজের এই উত্তরণ সংঘটিত হবার পর চারা এবং বন্য পশু সংগ্রহের অভিযাত্রার বদলে তা তাদের হস্তগত হওয়ায় তারা স্থায়ী নিবাস গড়েছে বটে, কিন্তু তার পিছনে মূল কারণ ছিল বপনকৃত চারা রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের আবশ্যিকতা অর্থাৎ এক্ষেত্রে মানুষের আবাস অঞ্চলের ধরণ ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে যা কিনা উদ্ভাবিত ঐ কৃষি প্রযুক্তিরই প্রসারতাকে নিশ্চিত করলো। এর মধ্য দিয়ে মানুষের আবাস অঞ্চলে যে উন্নত ধরণটি সূচিত হলো তা পুরোপলীয় সংস্কৃতিতে সম্ভবপর ছিল না। খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতিতে খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতির তুলনায় অধিকতর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছিল বলেই নানামুখী বিশেষীকরণ ঘটেছে, যা অধিক জনসংখ্যার বিস্তার এবং সেই সাথে আরও নানা মাত্রার সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাদির পত্তন ঘটায়। জ্ঞাতি সম্পর্কের অস্তিত্বসহ নবোপলীয় সংস্কৃতিতে আরো অনেক নতুন নতুন দলের আবির্ভাব ঘটেছে। ক্ল্যান (Clan), সিবজ (Sibs), লিনেজ (Lineages)-এ জাতীয় নানারকম দল নবোপলীয় সংস্কৃতিতে দেখা যায়। আবাস ভূমি, জনসংখ্যা, প্রযুক্তি, সামাজিক

সংগঠন ও ভাবাদর্শ একের সঙ্গে অন্যের যে সম্পর্ক তা এড়িয়ে যাবার কোন অবকাশ নেই, বরং প্রত্যেকটি সমাজব্যবস্থায় এই আন্তঃসম্পর্কগুলো বিরাজ করে পুরোপলীয় সমাজব্যবস্থার এই উপকরণাদির ধরনটির-ই বদল ও নতুনতর সমন্বয় ঘটেছে নবোপলীয় যুগে। আবার নবোপলীয় সংস্কৃতি এই সমন্বয়কে ধারণ করেই টিকেছিল। ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে এই সমন্বয়গুলো টিকে থাকে বটে, তবে তা স্থবির না থেকে নানামাত্রায় ক্রিয়াশীল থাকে বলেই সমাজ অভ্যন্তরে রদবদলগুলো সংঘটিত হয়। তবে একথাটি প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা যায় যে, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন সমাজ বদলের একটি অন্যতম নির্ধারক। নবোপলীয় সংস্কৃতিতে আমরা এই নির্ধারকটির মধ্যেই পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করি। Taylor যথার্থ বলেছেন যে,[১২] "Suffice it to say that it is also possible to argue that once the social and ideological components of a culture have become sufficiently developed they may influence techonology as much or more than the technology influences them."

নবোপলীয় যুগে সভ্যতার উত্তরণের পেছনে কাজ করেছে পুরোপলীয় যুগের দীর্ঘ বিবর্তনকালে এর অভ্যন্তরে ঘটিত প্রযুক্তি তথা চিন্তনের বিকাশ যা কিনা সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং কৃৎকৌশলগত উন্নয়নকেই নির্দেশ করে। এখানেই মানুষের সমাজে প্রযুক্তি বিকাশের সার্থকতা। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধিত হলে সমাজ অভ্যন্তরে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও ত্বরান্বিত হয়। অথবা এভাবে ও বলা যায় যে এর একটি অপরটির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। প্রসঙ্গত C. Easton বলেছেন[১৩] "The Neolithic revolulion was a social and intellectual revolulion rather than a technical one."

শুধুমাত্র খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতির যে নিগরে মানুষের কর্মপ্রক্রিয়া ও জীবনযাত্রা সীমিত ছিল বহু সময়কাল ধরে সেই সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল ভেঙ্গে নবোপলীয় মানুষ বিপ্লবাত্মক সফলতা বয়ে আনলো খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। স্থায়ীভাবে বসবাসের শূন্যতা কাটিয়ে উঠে নবোপলীয় মানুষ বসতি গড়লো, নতুন বন্দর, নগর গড়ার পথে পা ফেললো সভ্যতা, আর সেই সাথে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের অদ্ভুত সাফল্য। সবচে' বড় কথা মানুষ বশে আনলো তার চর্তুপাশ, তার প্রকৃতি ও প্রতিকূলতার অনেক কিছুকে। পশু গার্হস্থ্যকরণ, কৃষির আবিষ্কার, স্থায়ী বসবাস, খাদ্য উৎপাদন সামাজিক সংগঠনের বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে নবোপলীয় যুগে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

নবোপলীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– বিশ্বব্যাপী এই সংস্কৃতির সম্প্রসারণ। এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের প্রায় সর্বত্র স্থানীয় পরিস্থিতি সমন্বিত নবোপলীয় বিপ্লব ঘটে এবং ক্রমশঃ তা সম্প্রসারিত হয় পৃথিবীর সর্বত্র।[১৪] কারো কারো অভিমত নবোপলীয় যুগের সূচনা ঘটেছে আনুমানিক ১৫,০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে

এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে ধাতুর যুগ আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে। অবশ্য এরূপ রূপান্তরের ক্ষেত্রে সময়কালকে নির্দিষ্টতা দিয়ে আবদ্ধ করা মুস্কিল, তবে বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে এ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে তার প্রমাণ মিলেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় মিশরে ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়েছিল অথচ স্ক্যান্ডেনেভিয়া এবং ব্রিটেনে খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের আগে ধাতু ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়নি। Victor Barnow এর মতে, The term 'neolithic' has been applied to the period of plant and animal domestication in the near east between approximately 8000 and 3500 B.C.

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, নিকট প্রাচ্য (near east) শব্দটি অনেক ক্ষেত্রে মধ্য প্রাচ্য (middle east) প্রত্যয়টির সঙ্গে মিলিয়ে বিভ্রান্তির উদ্রেক হতে পারে। নবোপলীয় যুগের সূচনা ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নিকট প্রাচ্য বলতে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার বর্তমানে ইরান, ইরাক, তুর্কী, সিরিয়া, জর্দান এবং ইসরাইল রাষ্ট্রসমূহের যে অঞ্চল জুড়ে অবস্থিতি তাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। নবোপলীয় বিপ্লব সংঘটন সম্পর্কে Marvin Perry'র অভিমত[১৫] "Some 10,000 to 11,000 years ago, the new stone age or neolithic age began in the near east. During the neolithic age, human beings discovered farming, demesticated animals, established villages, polished stone tools, made pottery, and wove cloth. So important were these achievements that they are referred to as the Neolithic revolution." জনসংখ্যার বাড়তি চাপ অনুভূত হবার সাথে সাথে নবোপলীয় মানুষদের উদ্ভাবনী শক্তিরও প্রসার ঘটেছে। আবিষ্কারের মাত্রায় সংযোজিত হয়েছে নতুন নতুন ধারা। পাথুরে অস্ত্রের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত করেছে। পুরোপলীয় পাথুরে অস্ত্রকে নবোপলীয় যুগে আরো মসৃণ ও ধারালো করা হয়েছে। শুধু পাথর নয়; কাঠ ও হাড়ের ব্যবহারের নৈপুন্যেও নবোপলীয় সংস্কৃতি এগিয়েছিল। বর্শা, হার্পুন, কুঠার, কোদাল, কাস্তে, গাঁইতী ইত্যাদি নানারকম হাতিয়ারের সন্ধান মিলেছে নবোপলীয় অঞ্চল খননে। আগুনের আবিস্কারের পর তার ব্যবহার রপ্ত করার নিপুন কৌশলও নবোপলীয় মানুষ উদ্ভাবন করে। কৃষির আবিষ্কার ও পশুপালনের কৃৎকৌশল নবোপলীয় মানুষকে সমাজবদ্ধ করেছে আরো সুদৃঢ় বাঁধনে। যাযাবর জীবন যাত্রার বদলে গড়ে ওঠলো স্থায়ী বসতি। গাছ, কাঠ, পাতা, ঘাস এসব দিয়ে ঘর বানানো, পানির ওপর খুঁটি পুতে কুঠির নির্মাণ, নিজেদের ব্যবহারের জন্য সুন্দর মাটির পাত্র তৈরি, চাকা আবিস্কার, এমনকি চাকার সাহায্যে গাড়ি বানানোর কৌশল, চাকা থেকে চরকি নির্মাণ, চরকির সাহায্যে কাপড় বোনা এসব বিস্ময়কর প্রযুক্তিগত সাফল্য বয়ে আনে নবোপলীয় মানুষ।

নবোপলীয় যুগে মানুষের শ্রম-হাতিয়ার আর জীবনযাত্রার পদ্ধতিই যে শুধু পাল্টালো তা নয়, বরং মানুষের দৈহিক বিন্যাসেও বদল সংঘটিত হয়েছে। এই

রূপান্তরে তার মগজের পরিমাণ বেড়েছে। চিন্তা-চেতনার প্রসারতাই প্রযুক্তি বিকাশের মূল নিয়ামক। নবোপলীয় যুগে এই চিন্তার বিকাশ তথা প্রযুক্তিগত বিন্যাস একটি অন্যতম ধাপ। পাথর, জীবজন্তুর শিং আর পশুচর্ম ইত্যাদি কেটে ঘষে মেজে নিজেদের ব্যবহারোপযোগী করতে করতে এবং আগুন জ্বালাবার কায়দা রপ্ত করার মধ্য দিয়ে মানুষ তার হাতকে ব্যবহার করতে শিখলো নানাভাবে; এর ফলে তার হাতের কর্মক্ষমতা বেড়ে গেল, আরো সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হলো হাত দিয়ে, হাতের আঙুল আরো বেশি সক্রিয়তা ও চলৎশক্তি অর্জন করলো।

বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার তৈরির সময়ে মানুষকে নিশ্চয়ই ভাবতে হয়েছে কোন জিনিস দিয়ে অস্ত্র বানাতে হবে, তার আকার-ই বা হবে কী রকম, ভাবতে হয়েছে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে ঘাটলে বাঞ্ছিত অস্ত্রটি প্রস্তুত করা সম্ভব হবে তার পক্ষে। শিকারে বেরুবার পূর্বে নিশ্চয়ই তাদের পরিকল্পনা করে নিতে হতো-শিকারীরা কোথায় ওৎ পেতে থাকবে; কখন এবং কোথায় পশুপালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য এই পরিশ্রমই তাই তার চিন্তাভাবনার শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দিলো। মানুষের মাথার মধ্যে ক্রমশঃ মগজের পরিমাণ বেড়ে গেল, পিছন পানে ঢালু কপাল ধীরে ধীরে সামনে সরে এসে খুলির ভিতরে ক্রমবর্ধমান মগজকে তার জায়গা ছেড়ে দিলো, পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য মানুষ কথা বলতে শিখলো। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও বিপ্লববাদী ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস যথার্থই বলেছেন যে, শ্রমই মানুষকে মানুষ করেছে।

আসলে শ্রমের বিনিয়োগই মানুষকে মানুষ করলো। সাংস্কৃতিক রূপান্তর এনে দিলো। পুরনো আবিষ্কারের সঙ্গে নতুন কৃৎকৌশলের সংযোজন ঘটলো। শস্যবীজ থেকে গাছ জন্মানোর দৃষ্টান্ত তাদেরকে পুনরায় নতুন শস্যবীজ পুতবার উদ্ভাবনী শক্তি জাগালো। কাঠের লাঠির সাথে ধারালো প্রস্তরখন্ড বেঁধে তৈরি করলো কুড়াল। পশুর চোয়ালের সাথে ধারালো পাথরের টুকরো সংযুক্ত করে তৈরি হলো কাস্তে। সংগ্রহ করা খাদ্যশস্য প্রচুর পরিশ্রম করে চূর্ণ করতো পাথরের তৈরি উদু খলে। কাঁচা মাটি পুড়ে শক্ত কঠিন হয় বলে থালা বাটিও হাড়ি মাটি পুড়িয়ে তৈরি করা শিখেছিল নবোপলীয় মানুষেরা। সেই সাথে মাটি ও পাথর দিয়ে চুলা তৈরির প্রযুক্তি ও তারা উদ্ভাবন করেছিল।

গাছের ডাল ও ছাল দিয়ে ঝুড়ি বোনা, সুতো কাটা, জাল বোনা, পশুলোম ও শন দিয়ে কাপড় বুনোনের কৃৎকৌশলও আয়ত্ব করেছিল তারা। পুরোপলীয় যুগে মানুষ যেখানে শুধুমাত্র প্রকৃতির দানই হাত পেতে নিচ্ছিল, ফল-মূল সংগ্রহ করে, শিকারের জীবজন্তু মেরে, মাছ ধরে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছিল, নবোপলীয় প্রযুক্তির প্রসারতার ফলে গাছপালার আবাদ ও পশুর প্রতিপালনের মধ্যে দিয়ে একটি সামাজিক বিপ্লব তথা অগ্রসরতা প্রতিষ্ঠা পেলা। নিম্নের ছকটিতে এ বিষয়গুলো সারণীবদ্ধ করে দেখানো হলো।[১৬]

## সারণী– ৫
## পুরোপলীয় ও নবোপলীয় সংস্কৃতি বিকাশের চিত্র

| সময় | শ্রমের হাতিয়ার ও অন্যান্য দ্রব্য নির্মাণ | জীবিকা নির্বাহেরও জীবনযাত্রার প্রধান মাধ্যম | ধর্মবিশ্বাস ও শিল্পকলা |
|---|---|---|---|
| পুরোপলীয় যুগ | হাতে তৈরি ধারালো পাথুরে অস্ত্র, কাঠের শাবল ও লাঠি বল্লম, হাপুন, র‍্যাদা, পশুচর্ম, থেকে পরিচ্ছদ তৈরি। | সংগ্রহবৃত্তি, বিভিন্নভাবে পশু শিকার। মাছ ধরা........... যূথবদ্ধ আদিম মানুষের দল | যাদুবিশ্বাস, মানুষ ও প্রকৃতির সমস্ত কিছুর আত্মায় বিশ্বাস শুরু করা। গুহাচিত্র, মানুষ ও পশুর মূর্তি নির্মাণ। কৃষি কর্মের সাথে সম্পর্কিত |
| নবোপলীয় যুগ | তীর, ধনুক, কুড়াল, কোদাল কাস্তে, ডিঙি এবং কাপড় বোনার তাঁত, কাপড়ের পোষাক, মাটির পাত্র, কাঠের লাঙ্গল। | পশুকে পোষ মানানো, কৃষিকর্ম, কৃষিতে কোদালের ব্যবহার হস্ত শিল্প ........... প্রতিবেশীমুখী গোষ্ঠীর সম্প্রসারণ | প্রাকৃতিক শক্তির কাছে নতি স্বীকার, দেবমূর্তি, দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান |

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, নবোপলীয় সংস্কৃতির সবচে' উল্লেখযোগ্য একটি দিক হলো- বিশ্বব্যাপী এই সংস্কৃতির সম্প্রসারণ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অঞ্চলসহ ভারতীয় উপমহাদেশে এই সংস্কৃতির প্রসারতা ও কৃৎকৌশলের অনুসন্ধান সম্পর্কে ও নানারূপ অভিমত রয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে হিমযুগের পর থেকেই মানুষের বসবাস ছিল এমনটি অনুমান করা হয়ে থাকে। এরও আগে এখানে মনুষ্যরূপ এক ধরনের প্রাণের আবির্ভাব ছিল কিনা তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। শিবালিক পাহাড়ে নর বানরের দাঁত আর চোয়ালের হাড় পাওয়া গেছে। ক্রমে এই নরবানরই হয়তো বিবর্তিত হয়ে এই উপমহাদেশের বুকে মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েছিল, তবে এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে আজও কিছু বলার উপায় নেই।[১৭] কিন্তু পুরোপলীয় যুগ

থেকেই উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্রই যে মানুষের বসবাস ছিল তার বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নগর সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল, তাম্র যুগে নগর বিস্তারের উপাখ্যান ভারতীয় ঐতিহ্যকে শাণিত করে। কিন্তু সভ্যতা বিকাশের আগে পুরোপলীয় ও নবোপলীয় সংস্কৃতি বিকাশের অস্তিত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সমাহারও এ অঞ্চলে ঘটেছে। আসাম, দক্ষিণ ভারত, কাশ্মির, সিন্ধু, বেলুচিস্তান সহ বাংলার কিছু কিছু অঞ্চলে নবোপলীয় সংস্কৃতির উপকরণাদি সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভারতীয় নিম্নোক্ত ছয়টি অঞ্চলকে নবোপলীয় সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন।[১৮]

১. কাশ্মীর উপত্যকা উত্তরাঞ্চল
২. এলাহাবাদ, মির্জাপুর, রাওয়া এবং সিধি (Sidhi) জেলাভূক্ত বিন্ধ্যি মালভূমিসহ বেলান উপত্যকা।
৩. বিহার ও সারান জেলাসহ উত্তরাঞ্চল।
৪. আসাম ও পার্শ্ববর্তী হিমালয় অঞ্চলসহ উত্তর পূর্বাঞ্চল।
৫. ছোট নাগপুরের মালভূমি এবং এর সঙ্গে সম্প্রসারিত পশ্চিম বাংলা ও উড়িষ্যাসহ মধ্য পূর্বাঞ্চল এবং
৬. উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চল।

বাংলাদেশে পুরোপলীয় যুগের কয়েকটি পাথরের তৈরি হাতিয়ার পাওয়া গেছে। এর অধিকাংশই সংগৃহীত হয়েছে পুরাভূমি থেকে। ফেনী জেলার ছাগলনাইয়ায় নবোপলীয় যুগের শেষ দিকে পাথুরে হাত কুড়ালের সন্ধান মিলেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে দুটো পাথর যুগের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পর্বতে অশ্মীভূত কাঠের তৈরি একটি কৃপাণ আবিস্কৃত হয়েছে। পুরোপলীয় ও নবোপলীয় যুগের এরূপ নানারকম হাতিয়ারের সন্ধান থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে, বৃহত্তর নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম এলাকাসহ বাংলাদেশে পাথরের যুগ সংস্কৃতির নানারূপ তথ্য ও উপকরণাদি অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এর ছড়ানো-ছিটানো নানারূপ অনুসন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। কুমিল্লার শালবন বিহার ও আনন্দ বিহারে যে সমস্ত হাতকুড়াল ও পাথুরে হাতিয়ার পাওয়া গেছে তার বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বছরের মতো হবে বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। নরসিংদী জেলার উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত হাতিয়ার পাথুরে সংস্কৃতি বিকাশের শেষভাগের উপকরণ দিনাজপুরের অদূরে বানগড়েও পাথুরে সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমান্তের প্রান্ত ঘেঁষে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় ১ থেকে ৩ লক্ষ বছরের প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাঁকুড়া জেলার খাতরা এবং শুশুনিয়ায় প্রাপ্ত প্রত্নপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার থেকে এখানে দশ হাজার বছর আগেকার মানব বসতির প্রমাণ মেলে।[১৯] হুগলী জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের এগার মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত কুনকুনেতে পাথরের তৈরি একটি কুঠার ফলক পাওয়া

গেছে। রানীগঞ্জের কাছে পেনারোর কয়লা খনিতে অনুরূপ একট ফলক উদঘাটিত হয়েছে। বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদেনীপুর হুগলিসহ ভরতের নানা অঞ্চলে নবোপলীয় পাথুরে সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণাদি আবিস্কারের ভিত্তিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ অঞ্চলে মনুষ্যবাস ও তার নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। বাংলা অঞ্চল ও যে তা থেকে বাদ পড়েনি তার বেশ কিছু উপাত্ত ও অনুমানের যথার্থতা তৈরি হয়েছে। এ অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন ও প্রাণের অস্তিত্ব ও তার বিকাশের ধারাক্রমকে সুচারুরূপে উদঘাটন করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হবে এবং ঐতিহাসিক গতি মাত্রা নিরূপিত হবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ ও গবেষণা এগুলো একটি জ্ঞানবিস্তৃত বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা। এক একটি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে যে তথ্য সম্ভার আহরিত হয় জ্ঞানরাজ্যে তা মাইলফলক হিসেবে গন্য হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান এবং খনন কাজ সময়কে সুচারুরূপে নির্দেশ করে। একই সাথে সময়ের সংস্কৃতিকে উদঘাটনে প্রয়াসী হয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য সংগৃহীত হলে তা সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান এমনকি রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, অর্থ শাস্ত্রের আলোচনার ক্ষেত্রেও কার্যকর এক সহায়ক শক্তিতে রূপ নেয়। সবচে' বড় কথা একটি জাতি-রাষ্ট্র অথবা ক্ষুদ্র কোন অঞ্চলেও স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রিক ধারা ও ঐহিত্য উন্মোচনে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য ও উপকরণ বিস্ময়কর অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে এর প্রসারতা ও পরিচর্চা আবশ্যিক একটি বিষয়। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে নবোপলীয় সংস্কৃতি বিস্তারের যতটুকুন তথ্য ও উপকরণাদির সম্ভাব্যতার কথা নানা দিক বিবেচনায় বলা হয়ে থাকে তার প্রকৃত যথার্থতা নিরূপণ করার লক্ষ্যে নির্ভেজাল প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় মনোনিবেশ করা সম্ভব হলে আমাদের ঐতিহ্যিক মাত্রার ধরণ ও প্রসারতা সম্পর্কে আরো বেশি সপ্রতিভ ও নিপুন তথ্য আহরণ করা সম্ভব হবে। ঐতিহ্যিক ও আপন মহিমায় উজ্জীবিত হবার শক্তি ও সতেজতা বাড়াবে। এই অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন ও নবোপলীয় সংস্কৃতি বিকাশের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য কিছু অঞ্চলের যোগসূত্রতার সম্ভাব্যতা নিরূপণ করার দিকে এগুনো খুব বেশি একটা ভ্রান্ত অনুকল্প (Hypothesis) হবে বলে মনে হয় না।

## তথ্যনির্দেশ


১. Richard T. Schaefer, *Sociology: Brief Introduction*, 3rd edition (Free Testprep CD-Rom!) PP. 115-16.

২. Victor Barnouw, *An Introduction to Anthropology: Physical anthropology and archaeology*, Vol-I (4th edition), The Dorsey Press : Home wood, Illinois, 1982, P. 14.

৩. পুর্বোক্ত পৃ. ১৫।

৪. Stewart. C. Easton, *The Western Heritage*, Holt, Rinehart and winston : New York 1961. P. 2.

৫. Victor Branown পুর্বোক্ত পৃ. ১৮।

৬. Gerhard E. Ienski, *Power and privilege: A theory of social stratification*, Megraw Hall Book Company: New York 1966, P 92

৭. G.E. Lenski. পুর্বোক্ত পৃ. ৯২।

৮. Robert B. Taylor, *Cultural Ways: A concise edition of Introduction to cultural Anthropology,* 3rd edition, Allyn and Bacon, Inc. Boston, 1980, P. 92.

৯. R.B. Taylor, পুর্বোক্ত পৃ. ৯২।

১০. R.B. Taylor পুর্বোক্ত পৃ. ১১০।

১১. Robert J. Braidwood, *prehistoric Men,* 7th ed. Glenview, 111 Scott, Foresman and company, P. 88.

১২. R.B. Taylor, পুর্বোক্ত পৃ. ১১১।

১৩. S.C. Easton, পুর্বোক্ত পৃ. ১৬।

১৪. রতন লাল চক্রবর্তী, *সভ্যতার পটভূমি*, বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা ১৯৯৮, পৃঃ ৪।

১৫. Marvin Perry, *Western Civilization: Ideas, politics and society,* 2nd Edition. Houghton, Mifflin Compay : Boston, 1985, P.5.

১৬. ফিওদর করোভকিন, *পৃথিবীর ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ*, প্রগতি প্রকাশনঃ মস্কো, ১৯৮৩ পৃঃ ৪২-৪৩।

১৭. অজয় রায়, *বাঙালা ও বাঙালী*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোঃ ঢাকা- ১৯৬৯, পৃঃ ১২।

১৮. B.K. Thapar, "Fresh light on the neolithic cultures of India" in K.N. Dikshit (edited) *Archaeological Perspectives of India since independence*, Books : New Delhi 1985, p. 37

১৯. খন্দকার মাহমুদুল হাসান, *বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকীর্তি*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা ২০০০, পৃঃ ২১